Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা আজাদ

রোলঃ ২১৬০২১০২৩

তারিখঃ ৩১মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা আজাদ

রোলঃ ২১৬০২১০২৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ত্বলিবার নামঃ কানিজ ফাতেমা আজাদ, আইডিঃ ২১৬০২১০২৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মামুন রাশেদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Kaniz Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

কানিজ ফাতেমা আজাদ

আইডিঃ ২১৬০২১০২৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

মোজেযার পরিচয় জানার ফায়েদা:..6

মোজেযার সংজ্ঞা:...9

মোজেযার প্রকারভেদ:...10

মোজেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য :...10

নবী হওয়ার আগেই হযরত মুহাম্মদ সা: কে আল্লাহ যে মোজেযা দান করেছিলেন: 13

অলৌকিক ওহী:...14

অলৌকিক কুরআন:..16

রাসূল সা: এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র- এটাও এক মোজেযা:...19

মুহাম্মাদ সা: এর জীবনের কিছু মোজেযা: 21

আল্লাহ অলৌকিকভাবে রাসূল সা: কে রক্ষা করেন:..34

উপসংহার:...37

তথ্যসূত্র:...38

ভূমিকা:

মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে, মানুষ যেন এই দুনিয়ায় ও মৃত্যুর পরের জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে,সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে সব জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন। **কোরআনে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে অসীম দয়া: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন,যে তিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করে, তাদেরকে শুদ্ধ করে ও পবিত্র কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়; যদিও তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে"। (সূরা আল ইমরান; ৩:১৬৪)**

আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: "আমি তোমাকে পুরো বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি" (সূরা আম্বিয়া; ২১:১০৭)

এইসব নবী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ নিজ জাতিকে সত্যের আলো দেখাতেন; তাঁরা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান ও আল্লাহর নির্দেশ জানাতেন। দুনিয়ার পরবর্তী জীবনের জন্য নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর হুকুম মেনে চলার গুরুত্ব সবার কাছে পৌঁছে দিতেন। আল্লাহর তরফ থেকে আসা নবীদের আগমনের উপকারিতা খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছিল।

কুরআনে বলা হয়েছে: "বেশিরভাগ মানুষই ঈমান হারলো না" (সূরা রাদ; ১৩:১) "তুমি যতই চাও না কেন,বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাসী নয়"(সূরা ইউসুফ;১২:১০৩)

নবীদের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল- আল্লাহর বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কোন টাকা-পয়সা বা জাগতিক লাভ চাইতেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাদের কাম্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও প্রকৃত আল্লাহ ভীরু। আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে জাগতিক কোন লাভ তো তাদের হয়-ই নি বরং নানা ধরনের বিপদ- আপদের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এসব বিপদ তাঁদের ঈমানকে আরো মজবুত করেছে। নবীদের এই আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা, দৃঢ়চিত্ততা, আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রতিদানে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করছেন।

কুরআনে বলা আছে: "এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত: আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো ও আমার রাসুলরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান,পরাক্রমশালী" (সূরা মুজদালাহ; ৫৮:২১)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর তার রহমত বাড়িয়ে দেন ও বিপদমুক্তির উপায় করে দেন। কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাদের সাহস ও শক্তি বাড়ান, তাঁদের বোঝা হালকা করে দেন ও আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের মনোবল দৃঢ় করেন। **নবী ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ যেভাবে সাহায্য ও রক্ষা করেন,তা কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে- "নিশ্চয়ই আমি রাসূলদের ও মুমিনদের সাহায্য করবো এই দুনিয়ায় ও সেদিন যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে)" (সূরা মুমিন; ৪০:৫১)**

আল্লাহ কিছু রাসূলকে অলৌকিক কাজ করার শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন। অলৌকিকত্ব বা মোজেযা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর এক চ্যালেঞ্জ। এটা এমন এক ব্যাপার যা মানুষ নিজের শক্তিতে করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই হতে পারে। মোজেযা হল এমন এক প্রতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যাপার যা মানুষের উপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। এর দুই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়:

১. যারা বিশ্বাসী তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়

২. অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনে

যারা মোজেযায় বিশ্বাস করত না,তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয় একই ধরনের কিছু করে দেখাতে। যখন তারা তা পারল না,তখন আল্লাহর কালামে তা প্রকাশিত হয় ও অবিশ্বাসীদের ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়।

মোজেযার পরিচয় জানার ফায়েদা:

খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যে সকল মোজেযা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যেন আমরা সেগুলোর ইলম হাসিল করতে পারি। যাতে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয় এবং বাস্তব জীবনে আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আরো বেশি গুরুত্ব দেই। নবুওতের মিথ্যা দাবিদারদের মাঝে সবচেয়ে ভয়ানক মিথ্যুক হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী। সে তার মিথ্যা দাবির পক্ষে মিথ্যা মোজেযা দাবি করারও প্রয়াস চালিয়েছিলো। অথচ তার লাঞ্ছনার উদাহরণের কোনো শেষ ছিল না। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী মিথ্যা নবুওতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাবের চেয়েও তাকে বেশি অপদস্থ

করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকল মিথ্যা দাবিদার ও দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে এই উম্মাহকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জাতি রূপে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে এমন বহুবিধ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টিজীবকে প্রদান করা হয়নি। তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যাতে তারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে এবং সৃষ্টিকর্তার মর্জি মোতাবেক সুচারুরূপে জীবন পরিচালনা করতে পারে। তাদের দিকনির্দেশনার জন্য যুগে যুগে হেদায়েতের বার্তাসহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণের নবুওত ও রেসালাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নানা রকমের নিদর্শন প্রদান করেছেন। এ সব নিদর্শনকে পবিত্র কুরআনে আয়াত, বায়্যিনা, বুরহান, সুলতান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

* নিদর্শন বোঝাতে কুরআনে কারীমে 'আয়াত' শব্দের ব্যবহার এভাবে এসেছে-

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

"আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত। আপনি বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আর তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে ঈমান আনবে না, তা কীভাবে তোমাদের বোধগম্য করা যাবে"। (সূরা আনআম; ৬:১০৯)

* নিদর্শন অর্থে 'বায়্যিনা' শব্দের ব্যবহার এভাবে হয়েছে-

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً.

"তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এ উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন"। (সূরা আ'রাফ; ৭:৭৩)

* নিদর্শন বোঝাতে 'বুরহান' শব্দের ব্যবহার কুরআনে কারীমে এসেছে এভাবে-

فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

"এ দু'টি (লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত বগলের নিচ থেকে শুভ্র হয়ে বের হওয়া) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ (তথা নিদর্শন) ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। নিশ্চয় তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়"। (সূরা কাসাস; ২৮:৩২)

* নিদর্শন বোঝাতে কুরআনে কারীমে ‘সুলতান’ শব্দের ব্যবহার-

تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ.

“আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো, তোমরা তাদের ইবাদত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও, অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ (তথা নিদর্শন) উপস্থিত কর”। (সূরা ইবরাহীম; ১৪:১০)

আয়াত, বায়্যিনা, বুরহান, সুলতান ইত্যাদি শব্দ নিদর্শনের অর্থ ছাড়া অন্য অর্থেও কুরআনে কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য সম্ভবত পরবর্তী উলামায়ে কেরাম নিদর্শন বা মোজেযা বোঝাতে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং হাদীসবিশারদগণ এগুলোকে আলামাতুন নুবুওয়াহ বা দালাইলুন নুবুওয়াহ নামে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে ইলমুল আকাইদ শাস্ত্রীয়রূপ লাভ করার পর নবী-রাসূলগণের এসব নিদর্শনকে মোজেযা নামে অভিহিত করা শুরু হয়। কেননা, মোজেযা মানে এমন নিদর্শন, যা অন্য কোনো মানুষকে এরূপ বিষয় পেশ করতে অক্ষম সাব্যস্ত করে। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রাসূলগণের শরীয়ত যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়, সম্ভবত এ কারণেই তাদের মোজেযাগুলো তাদের সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করে অস্থায়ী মোজেযা প্রদান করা হয়েছে। যেমন হযরত মূসা আ.-এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, সালেহ আ.-এর উষ্ট্রী, হযরত ঈসা আ.-এর মোজেযা - মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে হস্তস্পর্শে সুস্থ করে দেওয়া ইত্যাদি।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া মোজেযাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা হল কুরআনে কারীম। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিরন্তন মোজেযা। কেননা, তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁকে দেওয়া শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই তাঁকে এ চিরন্তন মোজেযা প্রদান করা হয়েছে। এর অনুরূপ কোনো গ্রন্থ বা এর কোনো অংশবিশেষের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো রচনা পেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না।

মোজেযার সংজ্ঞা:

সংজ্ঞা-১.

المعجزة أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله.

'মোজেযা এমন বিষয়, যা অলৌকিক বা সাধারণ ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে প্রকাশ পায় এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতি আহ্বান করে, যা নবুওতের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার দ্বারা এমন ব্যক্তির সত্যবাদিতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য, যিনি দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত'।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, মোজেযার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা শর্ত, তাহলে তা মোজেযা বলে গণ্য হবে। শর্তগুলো এই-

ক. অলৌকিক বা সাধারণ ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া।

খ. কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতি আহ্বান করা।

গ. নবুওতের দাবির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

ঘ. যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেন, তার দাবির সত্যতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য থাকা।

সংজ্ঞা-২.

أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة.

'মোজেযা এমন বিষয়, যা অলৌকিক বা সাধারণ ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানযুক্ত এবং মোকাবিলার আশঙ্কামুক্ত'।

সংজ্ঞা-৩.

هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي،تأييدا لنبوته،وما يعجز البشر أن يأتوا بمثله.

'মোজেযা হল অলৌকিকভাবে প্রকাশিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা কোনো নবীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন, তাঁর নবুওতের প্রতি সমর্থন-দান বা তার নবুওতকে শক্তিশালী করার জন্য এবং যা মানুষকে তার অনুরূপ ব্যতিক্রমী বিষয় উপস্থাপন করতে অক্ষম করে দেয়'।

মোজেযা নামকরণের কারণ- ইমাম কুরতুবী বলেন,

سميت) أي المعجزة (معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها.

‘মোজেযা-কে মোজেযা বলা হয়, কেননা, মানুষ এর অনুরূপ কিছু পেশ করতে অক্ষম হয়ে থাকে’।

মোজেযার প্রকারভেদ:

মোজেযা দু’প্রকার।

এক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা (حسية معجزة)

দুই. যুক্তিগ্রাহ্য মোজেযা(عقلية معجزة)।

বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা যে মোজেযা উপলব্ধি করা যায়, তাকে حسية معجزة বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা বলে। যেমন, মূসা আ.-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া, তাঁর শ্বেত-শুভ্র হাত ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযাগুলো সাধারণত সাময়িক এবং অস্থায়ী হয়। পক্ষান্তরে যে মোজেযা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; বরং যুক্তি ও জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা যায়, তাকে عقلية معجزة বা যুক্তিগ্রাহ্য মোজেযা বলা হয়। যেমন মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম। যুক্তিগ্রাহ্য মোজেযা সাধারণত চিরন্তন ও স্থায়ী হয়।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ‘বনী ইসরাঈলের নবীগণের অধিকাংশ মোজেযা ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কেননা সে যুগের মানুষের মেধা ছিল দুর্বল এবং তাদের সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান ছিল কম। আর এ উম্মতের সামনে প্রকাশিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ মোজেযা হল যুক্তিগ্রাহ্য। এর কারণ প্রথমত এই যে, এ উম্মতের মেধা ও বোধশক্তি পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের তুলনায় প্রবল ও ঋদ্ধ। দ্বিতীয়ত এই ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাই এ উম্মতের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ও স্থায়ী মোজেযা প্রদান করা হয়েছে, যাতে জ্ঞানবান লোকেরা তা দেখতে পায়’।

মোজেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য :

আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা এ জগৎকে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ভাল-মন্দের সংমিশ্রণে পয়দা করেছেন। একদিকে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা পয়দা করেছেন তো অপরদিকে শয়তান সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে একদিকে আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জামাত পয়দা করেছেন। তার বিপরীতে দাজ্জালের দল সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং নবুওতের বিপরীতে কিছু সৃষ্টি করবেন না, তা কী করে হয়, তাই রাশিগণনা ও জাদু সৃষ্টি করে নবুওতের বিপরীত অবস্থান পূর্ণ করেছেন। ভাল ও মন্দের এসব পরস্পর বিপরীত শক্তির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না, কিন্তু বিভ্রান্তির এ জগতের অনেকেই (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। (যেমন হযরত মূসা ও ঈসা আ.-কে যেমন তাদের যুগের প্রতিপক্ষ কাফের সম্প্রদায় জাদুকর বলেছে, তেমনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মক্কার কাফেররা জাদুকর বলেছে। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য মোজেযা ও জাদুর মধ্যে কী পার্থক্য তা উল্লেখ করা হচ্ছে।)

মোজেযা ও জাদু উভয়টির আপন আপন পরিচয়, প্রকাশকারী সত্তা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন :

১. মোজেযার প্রকাশ হয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় যার হাতে মোজেযা প্রকাশ পায় এতে তার কোনো দখল থাকে না। পক্ষান্তরে জাদুর প্রকাশ ঘটে শিরক সম্বলিত কালামের রিপুগত অভিনিবেশ এবং নানারকম মন্দ আত্মার সাহায্যে।

২. মোজেযা যাদের নিকট থেকে প্রকাশ পায় তারা হলেন, পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ গুণাবলীর অধিকারী, আর জাদুকরেরা হয়ে থাকে দুরাত্মার অধিকারী।

৩. যাদের নিকট থেকে মোজেযা প্রকাশ পায় তাদের পরিণতি হল কামিয়াবী ও সফলতা, আর জাদুকরদের পরিণতি হল ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা।

৪. মোজেযা প্রকাশ করা মহান আল্লাহ তাআলার কাজ এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, আর জাদু হল জাদুকরের নিজের বানানো খেলা।

৫. মোজেযা নবী ও রাসূলের ইচ্ছাধীন নয় যে, তারা ইচ্ছা করলেই তা দেখাতে পারবেন, পক্ষান্তরে জাদু জাদুকরের ইচ্ছাধীন। যখনই সে চায় তা দেখাতে পারে।

৭. মোজেযা প্রকৃতিগত উপকরণের মধ্যস্থতা ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ, আর জাদু অদৃশ্য প্রকৃতিগত উপকরণের সাহায্যে সংঘটিত হয়। অদৃশ্য উপকরণের কথা জানা থাকলে জাদু আর বিস্ময়কর থাকে না, আর জানা না থাকলে বিস্ময়কর মনে হয়।

৮. জাদুকর যদি নবুওতের দাবি করে তবে তার জাদু কাজ করে না, তাই তার নিকট থেকে বিস্ময়কর কিছু প্রকাশ পাবে না। সুতরাং নবুওতের দাবির সাথে জাদু কখনো চলে না। এটা এজন্য নয় যে, তা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব; বরং এর কারণ এই যে, জাদুকর যদি নবুওতের মিথ্যা দাবি করে তখন যাতে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার না হয়,

এজন্য আল্লাহ তাআলা তার হাতে চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু প্রকাশ করেন না।

আল্লামা রামাদান ইবনে মুহাম্মাদ আফান্দী রাহ. বলেন, মোজেযা ও জাদু একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং এতে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

এক. জাদুবিদ্যা অর্জনের জন্য কোনো জাদুকরের শিষ্যত্ব লাভ করতে হয় এবং তার নিকট থেকে জাদুর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জাদু প্রদর্শনে শিষ্য কখনও গুরুর চেয়ে অধিক দক্ষ হতে পারে। পক্ষান্তরে মোজেযা কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বা কারও নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অর্জন করা যায় না। মোজেযার প্রকাশ ঘটানো সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার কর্ম, যা তিনি তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন।

দুই. জাদুর প্রকাশ কারও আবদার মোতাবেক হয় না; বরং জাদুকরের বিদ্যা অনুযায়ী হয়। সুতরাং যে কয়টি বিষয়ে তার জাদুবিদ্যা আছে, কেবল সেগুলোই সে প্রকাশ করতে সক্ষম। তার বিদ্যার বাইরে কোনো কিছু সে প্রদর্শন করতে পারে না। পক্ষান্তরে মোজেযার প্রকাশ আল্লাহর ইচ্ছায় আবদারকারীদের যে কোনো আবদার মোতাবেক হতে পারে। কেননা মোজেযা মানুষের সীমিত বিদ্যা বা শক্তির আওতাধীন নয়; বরং আল্লাহর শক্তির অধীন। তিনি আবদারকারীদের যে কোনো আবদার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। যেমন, পাথর থেকে উটনী বের করা, আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ইত্যাদি।

তিন. মোজেযার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া ফলগুলো প্রকৃত ও বাস্তব। যেমন সামান্য খাবার দ্বারা অনেক মানুষের পেটভরে আহার করা, সামান্য পানি দ্বারা অনেক মানুষের অযু ও পানীয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া। কিন্তু জাদু তার বিপরীত। জাদুর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া ফলগুলো প্রকৃত ও বাস্তব নয়; বরং জাদু হল দৃষ্টি ও কল্পনার ভ্রম সৃষ্টি মাত্র, যার প্রকাশ নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ব্যতীত সম্ভব হয় না।

উল্লেখ্য যে, জাদু দুই প্রকার:

এক. বিস্ময়কর বা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনো কথা বা কর্মকাণ্ডের প্রকাশ, যা তন্ত্র-মন্ত্র, কুফরী-কালাম বা শয়তান ও জিনের সাহায্যে হয়ে থাকে। এরূপ জাদু শিরক বা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. এমন কিছু বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের প্রকাশ, যা কিছু অদৃশ্য উপায়-উপকরণের সাহায্যে অথবা বুদ্ধিগত কলাকৌশলের সাহায্যে হয়ে থাকে। এটা সমাজে জাদু নামে পরিচিত হলেও মূলত এর নাম ভোজভাজি, ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, ভেল্কিবাজি, ম্যাজিক ইত্যাদি। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে শিরক বা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত না হলেও কাজ বা পেশা হিসেবে প্রশংসনীয় নয়। এটা অনর্থক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত, যা বর্জনীয়। এটাকে যদি প্রতারণার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয় তবে তা অবশ্যই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নবী হওয়ার আগেই হযরত মুহাম্মদ সা: কে আল্লাহ যে মোজেযা দান করেছিলেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বছর বয়সে নবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তবে ওহী লাভের আগেই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা ভবিষ্যতে তার নবী হওয়ার ইশারা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় দাইমা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মা আশ শিফা। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার হাতে জন্মান ও হাসি দেন, তখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পান কেউ একজন বলছে- আপনার উপর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি আরো বলেন, পুরো পৃথিবী যেন আলোকময় হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল সালাম যখন পথ চলতেন, তখন সবসময় তার ওপর ছায়া থাকতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি দেখেছিলেন দুজন ফেরেশতা তার স্বামীকে পথ চলার সময় ঢেকে রেখেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাইমা বণী সাদ ইবনে বাকর গোত্রের বিবি হালিমা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাথে ছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন মেঘ তাঁকে সব সময় ছায়া দিতো।

এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এক শুকনো গাছের নিচে বসেন। গাছটি সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে ও প্রচলিত বর্ণনামতে গাছের ছায়া

বেড়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঢেকে ঢেকে রাখে। গাছটির আশেপাশের গাছগুলোও সতেজ, সবুজ হয়ে ওঠে।

নবী হওয়ার সময় যখন কাছেই, তখন তিনি স্বপ্নের যা দেখতেন তাই সত্য হতো। হাদিস থেকে জানা যায়, প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল বুখারী এসব স্বপ্নের বিবরণ তার বইতে দিয়েছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় যখন এসেছিল তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময়ই স্বপ্নে যা দেখতেন তা সত্য হতো। এমনটি কখনো হয়নি যে তিনি ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে যা দেখেছেন তা ঘটেনি। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে এ ধরনের স্বপ্ন দেখার কারণ হলো রাসূল হওয়ার গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য তাকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

অলৌকিক ওহী:

ওহী গ্রহণের সময় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা- ওহী যখন আসতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুভূতি কেমন হতো তা হাদিসে বলা হয়েছে। ওহী গ্রহণের সময় সাহাবীরা বলেছেন, তারা মৌমাছির গুনগুন আওয়াজ এর মত শব্দ শুনতে পেতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মুখে চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জন ধোনির মতো শব্দ পেতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা যখন আমার কাছে আসেন, তখন কখনো আমি এমন কণ্ঠস্বর শুনি যা অনেকটা ঘন্টা ধ্বনির মত। এই অবস্থা যখন শেষ হয় তখন আমি মনে করতে পারি ফেরেশতা কি বলেছিলেন। এই ধরনের ওই নাযিল আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন বোধ হতো। কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে কথা বলতেন। আমি তা বুঝতে ও মনে রাখতে পারতাম।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এক শীতের দিনে আমি দেখেছি রাসুল সা: ওহী গ্রহণ করছেন আর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। যায়েদ ইবনে সাবিত বলেন, আমি ওহী লিখতাম। যখন হয়ে আসতো রাসূল সা: বেশ অবসন্ন হয়ে পড়তেন তখন মুক্তার

মত ঘাম বের হতো। ওহী গ্রহণ শেষ হলে তিনি তা তেলাওয়াত করতেন আর আমি লিখতাম।

আবু হুরায়রা বলেন, যখন আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসতো, তখন রাসূল সা: এর অবস্থা জ্ঞান হারানোর মতো হতো।

ওহী নাযিল হওয়ার পুরোটা সময় জুড়েই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সমর্থন যুগিয়েছেন ও মানুষের কাছে সঠিকভাবে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন।

কিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উপদেশ দিয়েছেন- "মুখস্ত করার জন্য তুমি ওহী নাযিলের সময় তাড়াতাড়ি জিহ্বা নাড়বে না; এর সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার; তাই যখন এটি তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা অনুসরণ করো; এরপরে এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার"। (সূরা কিয়ামাহ; ৭৫:১৬-১৯)

কুরআনের সব আয়াত মনে রাখতে পারাটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আল্লাহর একটি মোজেযা দান।

দরকার মত কোরআন আয়াত মনে করতে পারার জন্য দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াটা রাসুল সা: এর জন্য সহজ হয়েছিল- "সরল পথকে তোমার জন্য সহজ করে দেবো"। (সূরা আ'লা; ৮৭:৮)

পুরো কুরআন মুখস্থ করতে পারা বা কোরআন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা আল্লাহর তরফ থেকে মোজেযা। এর মাধ্যমে কোরআনকে সংরক্ষণ করা ও এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে এটি কখনো বিকৃত হবে না বা মানুষ কোরআন ভুলে যাবে না। এই মোজেযা আজো অব্যাহত আছে। অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনে হাফেজ।

"আল্লাহর কিতাবের যে বাণী তোমার কাছে আসে তা তেলাওয়াত করো। কেউ আল্লাহর বাণীকে বদলে দিতে পারবেনা। কখনোই তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে পাবে না"। (সূরা কাহফ; ১৮:২৭)

অলৌকিক কুরআন:

কুরআন হলো আল্লাহর কথা যা এসেছে সবার জন্য ও শুধু সেই সময়ের জন্য নয় এবং পরবর্তী সব যুগেরই জন্য। কুরআনকে কেন মোজেযা বলা হবে তার অনেক কারণ রয়েছে। তিনটি প্রধান কারণ হলো: অসাধারণ ভাষা শৈলী, বিষয়বস্তু ও আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণ।

অসাধারণ ভাষা শৈলী- কুরআন আরববাসীর কাছে আরবি ভাষায় নাযিল হয়। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কালে আরবে কাব্য ও সাহিত্য ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। অত্যন্ত প্রতিভাবান সব কবি ছিল যাদের আরবি ভাষায় ছিল খুব ভালো দখল। আরবি ভাষা ও সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এমনই এক সময়ে কোরআন আরববাসীদের কাছে তাদের ভাষায় নাযিল হয়। রাসুল সা: যখন মক্কার কাফেরদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনান, তখন তারা শুনে মুগ্ধ হয়। অনেক মানুষ ইসলাম কবুল করে শুধুমাত্র কোরআনের চমৎকার বাণী শুনেই। কুরআন শুনে মুগ্ধ হয়ে যারা মুসলমান হন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন উমর ইবনে আল খাত্তাব। ইনি আগে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। সূরা ত্বোহা' এর প্রথম কয়েক লাইন শুনে অভিভূত হয়ে তিনি সত্য ধর্মকে মেনে নেন। অনেক মানুষ কোরআন শুনে যদিও ইসলাম কবুল করেনি, তারা এর উত্তর দিতেও ব্যর্থ হয়। অবিশ্বাসীরা রাসূল সা: কে ঠাট্টা তামাশা করে ও অভিযোগ আনে যে তিনি নিজেই কুরআন লিখেছেন।

যখন কুরআন আসলো তখন তা একই সাথে বিশেষজ্ঞদের সামনে চারটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ জুড়ে ছিল।

প্রথমত: মানুষকে সেজদায় অবনত হতে বলল, তারা আশ্চর্য হয়ে তা শুনলো।

দ্বিতীয়ত: কোরআন আরবের বিখ্যাত কবি ও আবৃত্তিকারদের হতভম্ব করে দেয়। স্তম্ভিত এইসব কবির দল নিজেদের ব্যর্থতায় হতাশা আঙ্গুল কামড়াতে থাকে।

তৃতীয়ত: যারা জাদু-টোনা ও ভবিষ্যৎবাণী করত তারা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জানার চেষ্টা বন্ধ হয়। দুষ্ট জ্বীনরা বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয় ও ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টার ইতি ঘটে।

চতুর্থ: কুরআন নানা ভুল তথ্য, জালিয়াতি, উপকথা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। জ্যোতির্বিদ্যা, অতীতের ঘটনা, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন মানুষকে সঠিক তথ্য দেয়।

এভাবে এই চারটি দল চমৎকৃত হয়ে কোরআনের সামনে মাথা নত করে ও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে কোরআনের ছাত্র হয়। এদের কেউ কুরআনের একটি আয়াতের সাথেও দ্বিমত পোষণ করতে সাহস পায়নি।

কুরআনে অনেক কিছু বারবার বলা হয়েছে যার ফলে পাঠকের জন্য বুঝতে পারা ও মনে রাখা সহজ হয়।

"আমি কোরআনকে বুঝতে পারা ও মনে রাখার জন্য অবশ্যই সহজ করে দিয়েছি"। (সূরা কামার; ৫৪:১৭)

"আল্লাহ পাঠিয়েছেন ধর্ম বিষয়ে সেরা উপদেশ, একটি কিতাব যাতে পুনরাবৃত্তি রয়েছে সুসংহতভাবে"। (সূরা যুমার; ৩৯:২৩)

কুরআনের বিষয়বস্তু- কুরআন হলো ঐশী বাণী। মানবজাতির জন্য এতে রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়েত। নিজেকে চিনতে এটি মানুষকে সাহায্য করে, কুরআন মানুষকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সব তথ্য দেয়, যা কোন মানুষ বা জিন ফেরেশতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কুরআন যা বলে তা সত্য। এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য যা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা গিয়েছে, তা চৌদ্দশত বছর আগেই কুরআন কুরআনে বলা হয়েছে। কুরআনের ঐশ্বরিক চরিত্র ওহী নাযিলের শুরুর সময় থেকে ভবিষ্যতের সব মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কুরআনের আদেশ নিষেধ কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য।

"আর এই (কোরআন) তো আর কিছু নয় বরং পুরো বিশ্বজগতের জন্য সতর্কবাণী"। (সূরা কালাম; ৬৮:৫২)

কুরআনের সংরক্ষণ- কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এটা যেভাবে এসেছিল আমরা ঠিক সেই অবিকৃত কুরআনই আমাদের মাঝে পাই ।

কুরআনে বলা হয়েছে- "আমিই কুরআন পাঠিয়েছি ও আমিই একে হেফাজত করবো"। (সূরা হিজর; ১৫:৯)

আরো বলা হয়েছে- "আল্লাহর বাণী কেউ বদলাতে পারবে না"। (সূরা কাহফ; ১৮:২৭)

কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে আশা প্রথম আসমানী কিতাব নয়।

কুরআন বলছে- "আল্লাহ সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছেন তোমার কাছে যা আগের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করে। আর তিনিই পাঠিয়েছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল মানুষের হেদায়েতের জন্য"। (সূরা ইমরান; ৩:৩-৪)

কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব ও আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও আগে যেভাবে কুরআন পড়া হত ঠিক সেভাবেই আজও পড়া হয়। সব যুগেই কুরআন অবিকৃত থাকবে। কুরআন লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়। খলিফা আবু বকর রা: এর সময় কুরআনের একটি কপি বাধাই করা হয়। খলিফা ওসমান রা: এর সময় কোরআনের একাধিক কপি তৈরি করে ইসলামের প্রধান নগরীতে পাঠানো হয়। ঐশ্বরিক উপায়ে কুরআনকে অবিকৃত রাখা হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই কুরআন তাই এত শক্তিশালী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কিতাব।

কুরআনে বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কিতাব। কোন মিথ্যা এতে আসতে পারে না, সামনের থেকেও না, পিছনের থেকেও না। এই কোরআন তাঁর কাছ থেকে এসেছে যিনি অতি জ্ঞানময়, সব প্রশংসার মালিক"। (সূরা ফুসিলাত; ৪১: ৪১-৪২)

আরো বলা হয়েছে- "যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে পেতে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় নত ও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। আমি এসব উদাহরণ দেই যাতে মানুষ ভেবে দেখে"। (সূরা হাশর; ৫৯:২১)

কুরআন তেলাওয়াতের ফায়দা অনেক। কুরআনকে বুঝতে পারলে শুধু এই দুনিয়ায় নয় বরং পরকালেও অনেক লাভ আছে।

কুরআনে বলা হয়েছে- "মানুষের জন্য এটা অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রহমত"। (সূরা জাসিয়া; ৪৫:২০)

কোরআন তেলাওয়াত মনকে শান্ত রাখে, হৃদয়ে শান্তি দেয়। এটা আত্মার খোরাক।

বিশ্বাসীদের জন্য কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে পথপ্রদর্শক ও ক্ষমা: "কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণেই (যিকির, ইবাদতে) মনে শান্তি আসবে"। (সূরা রাদ; ১৩:২৮)

আরো বলা হয়েছে- "যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন শান্তভাবে তা শুনো যাতে আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারো"। (সূরা আরাফ; ৭:২০৪)

রাসূল সা: এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র- এটাও এক মোজেযা:

আল্লাহর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সম্মানিত মানুষ ও আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে তাঁর ওপর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক অনুগত দাস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন ও দুনিয়াতে তাঁকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আস্থাভাজন। সততার দিক থেকে তিনি ছিলেন সবার আদর্শ। তিনি আল্লাহর একজন মহান রাসূল যার তাকওয়া, উন্নত স্বভাব চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। তাঁর সহানুভূতি, ভদ্রতা, অসাধারণ সহমর্মিতা, বিশ্বাস, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদির জন্য তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক নেতা ও আমাদের সবারই আদর্শ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জাতির কাছে পরিচিত ছিলেন আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে। সবাই একমত ছিল যে রাসূল সা: হলেন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যারা তাঁর কথা শুনতো বা তাঁর সাথে আলাপ করতো, তারা বুঝতে পারতো ইনি একজন বিশেষ কেউ। তারা অনেক প্রমাণ পেত যে ইনি একজন নবী। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র মহত্বের জন্য এমনকি অমুসলিমরাও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে যেত। রাসূল সা: এর মহত্ব ও পবিত্রতা সাহাবীরা সবসময়ই প্রত্যক্ষ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপূর্ব চরিত্র সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল গাজ্জালী বর্ণনা করেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সাহসী মানুষ, সবচেয়ে ন্যায় পরায়ন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনকারী মানুষ। সবচেয়ে দয়াশীল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য যে জীবিকা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কখনোই তাঁর থেকে এক বছরের বেশি কিছু জমা রাখতেন না। বেশি খাবার থাকলে তা গরিবদের মাঝে দান করতেন। কেউ কিছু চাইলে তা দিয়ে দিতেন। এমনকি তাঁর কাছে যা আছে তার বেশিও তিনি দান করতেন। তিনি সবসময় সত্য বলতেন যদিও তা কখনো কখনো তাঁর নিজের ও সাহাবীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করত। রাসূল সা: এর মহৎ চরিত্র, প্রতিকূলতার মুখে তার অসাধারণ দৃঢ়তা, তাঁর উদার ভদ্র স্বভাবের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। **গুণাবলীর কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে- "তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে যা কখনো শেষ হবে না; অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের"। (সূরা কালাম; ৬৮:৩-4) আরও**

বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই কোরআনের এক সম্মানিত বার্তা বাহক (জিবরাঈল আ:) নিয়ে এসেছেন"। (সূরা হাক্কা; ৬৯:৪০)

উম্মি হওয়ার পেছনে ঐশ্বরিক রহস্য- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহী লাভ করেন, তখন তিনি লিখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না। এক কথায় উম্মি। উম্মি অবস্থায় কোরআন লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে তিনি হলেন সত্যিই রাসূল সা:। অবিশ্বাসীরা যদিও জানতো যে রাসূল সা: কে কোন মানুষ কখনো লেখাপড়া শেখায় নি, তবুও কাফেররা এটা মেনে নেয়নি যে কোরআন আল্লাহর বাণী। তারা বরং অভিযোগ তুলে যে রাসুল সা: নিজেই এটা লিখেছেন। অথচ ঐ কাফিররা নবুয়তপ্রাপ্তির অনেক আগে থেকেই তাঁকে চিনতো ও ভালোভাবেই জানতো যে কোরআন লেখার মত জ্ঞান তার নেই। **কুরআনে আল্লাহ বলেন- "তোমার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়েছি আমার আদেশে; তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী; আমি কুরআনকে করেছি নূর যাকে দিয়ে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করি। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ দেখাও"। (সুরা শুরা; ৪২:৫২)**

আরো বলা হয়েছে- "আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন কিতাব ও জ্ঞান ও শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার উপর আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে"। (সূরা নিসা; ৪:১১৩)

উম্মি হওয়ার পরেও রাসূল সা: খুবই সার্থকভাবে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে নিয়ে যান। আগেকার আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দান করেন। আল্লাহ যখন রাসূলকে কোরআনের বাণী পাঠান তখন আগের কিতাব ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আল্লাহর ওহী ছাড়া অতীতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না।

কুরআনে বলে- "যারা উম্মী রাসূলকে মেনে চলে যার উল্লেখ তারা পেয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে, যিনি তাদেরকে ভালো কাজ করতে বলে খারাপ কাজে নিষেধ করেন, পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেন, তাদের ভারী বোঝা ও শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যারা এই রাসুলের উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান ও সাহায্য করে এবং তাঁর কাছে পাঠানো নূরের অনুসরণ করে- তারাই সফল"। (সূরা আরাফ; ৭:১৫৭)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে রাসূল সা: এর নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা আসমানী কিতাব গুলিতে বলা হয়েছে। না হলে হযরত মুহাম্মাদ সা: এমন দাবি নিশ্চয়ই করতেন না। তাছাড়া তাঁর এই দাবি প্রত্যাখ্যান করার সুযোগও অমুসলিমরা তখন পেয়ে যেত। তিনি

এমন একজন মহান রাসুল ছিলেন যিনি মানব জাতিকে উপদেশ দিতেন সত্যের পথে আসতে, এক আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতে, যথার্থ বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অর্জন করতে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে দয়া করতে বলতেন এবং অন্যায় করতে নিষেধ করতেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণী আসমানী কিতাবের মানুষের কাছে করা হয়েছিল, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত মোজেযা। বিভিন্ন জিনিস প্রত্যক্ষ করে এই কিতাবীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায়, তারাই এই সত্যকে নিশ্চিত করে।

মুহাম্মাদ সা: এর জীবনের কিছু মোজেযা:

আল্লাহর পক্ষ থেকে সারা জীবনভর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক মোজেযা দান করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কুরআন নাযিল হওয়া ও কুরআন নিজেই সব মোজেযার মধ্যে সেরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসাধারণ চরিত্র, তার কাজ এমনকি হাদিসও মোজেযা। এছাড়াও আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ঘটেছে যার কথা কুরআন ও রাসূলের জীবনীতে বলা হয়েছে। নিচে কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হলো-

১. রাতের অভিযান ও আকাশ ভ্রমণ (শবে মেরাজ):

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে যেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শবে মেরাজ। এটি হিজরতের ১বছর ৭মাস আগে ঘটে। হাদিসে বলা হয়েছে- রাসূল সা: এর কাবার পাশে ঘুমাচ্ছিলেন। তখন জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসে ও একটি সাদা প্রাণী (গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি) বোরাকের উপর তাঁকে বসান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোরাকে চড়ে মক্কার মসজিদ উল হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় যান (আকসা শব্দের অর্থ দূরবর্তী)। জিব্রাইল আ: এর সাথে রাসুল সা: আসমান ভেদ করে আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময় বিভিন্ন নবী ও রাসুলের দেখা পান। এরা হলেন আদম, ঈসা, ইয়াহিয়া, ইউসুফ, ইদরিস, হারুন মুসা ও ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম। **রাসূল সা: সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছান ও ওহী লাভ করেন- "রাসূল বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে যা হয়ে এসেছে তাতে ও মুসলমানরাও। তারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহ,**

ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও আল্লাহর রাসূলদের উপর। তাঁরা বলে, আমরা রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি ও কবুল করেছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো"। (সূরা বাকারা; ২:২৮৫)

মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য"। (সূরা ইসরা; ১৭:১)

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে যান ও সেখানেই তিনি আদেশ লাভ করেন যে মুসলমানরা এখন থেকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে।

আকাশে সিদরাতুল মুনতাহের রাসূল সা: এর যাওয়া নিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে- "নিশ্চয়ই সে (রাসূল সা: তাঁকে জিব্রাইল আ:) কে আরেকবার দেখেছিল শেষ সীমানার কুল গাছের কাছে; যার পাশে আছে জান্নাত; যা দিয়ে ঢাকা থাকার কথা (অর্থাৎ আল্লাহর নূর) দিয়ে কুল গাছটি ঢাকা ছিল; তাঁর দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটে নি বা দৃষ্টি লক্ষ্য চ্যুত হয়নি। সে তাঁর প্রভুর কিছু সেরা নিদর্শন দেখেছে"। (সূরা নাজম; ৫৩:১৩-১৮)

ফিরে আসার পর রাসূল সা: কুরাইশদের বললেন গতরাতে কি ঘটেছে। অবিশ্বাসীরা এমনকি কিছু দুর্বল ইমানের মুসলমানরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোজেযায় অবিশ্বাস করল। কাফিররা হযরত মুহাম্মদ সা: কে নানা প্রশ্ন করে জানার জন্য যে তিনি শক্তি না মিথ্যা বলছেন। রাসূল সা: তাদের সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন। এরপরেও কাফিররা রাসূল সা: এর মেরাজকে অস্বীকার করলে ও প্রমাণ চাইলো। আল্লাহর সাহায্যে রাসূল সা: তাদেরকে প্রমাণ দিলেন- যা তারা অস্বীকার করতে পারলো না। রাতের ভ্রমণ ও আকাশে যাওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম সেরা মোজেযা যা তাঁর বার্তাকে শক্তিশালী করে। মেরাজের ঘটনা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কাফেররা সন্দেহ নিয়ে যত প্রশ্ন রাসূল সা: কে করেছিল, আল্লাহ সেসবের উত্তর দিতে তাঁকে সাহায্য করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে রাসূল সা: সত্যবাদী।

২. আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ইসলামের জন্য চাঁদকে দুই টুকরো করেন:

অসাধারণ মোজেযা যা রাসূল সা: কে দান করা হয় তা হলো চাঁদকে দুই টুকরো করা। **কুরআনে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে সূরা কামারে- "কেয়ামতের সময় কাছেই এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে"**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ জানান- আল্লাহর রাসূল সা: এর সময়ে চাঁদ দুই টুকরো হয়। চাঁদের এক অংশ পাহাড়ের উপরে, অন্য টুকরো পাহাড়ের পেছনে চলে যায়। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই মোজেযা দেখো (বুখারী)। মক্কার লোকেরা রাসুল সা: কে মোজেযা দেখাতে বললে দুইবার তিনি চাঁদকে বিচ্ছিন্ন করেন। স্পষ্ট মোজেযা দেখার পরেও মূর্তি পূজারী কুরাইশরা রাসূল সা: কে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। তারা যা দেখেছে তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

তারা অভিযোগ করে যে এটা একটা জাদু: "তারা কোন নিদর্শন দেখলে অন্যদিকে ফিরে যায়, বলে: এতো সেই আগেকার জাদু। তারা সত্যকে অস্বীকার করে ও নিজেদের খেয়াল ও ইচ্ছামতো চলে; সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে"। (সূরা কামার; ৫৪:২-৩) আল্লাহ কুরআনে বলেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মোজেযাগুলোর মধ্যে এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতির (বংশপরম্পরা অনেক মানুষ যে ঘটনা জেনেছে ও অন্যকে বলেছে। এই ঘটনায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই)। যার সত্যতা সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত। বিভিন্ন সাহাবী এই মোজেযার কথা বলেন। মোজেযা ঘটে নবুয়তের প্রমাণ দিতে ও কাফিরদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য- কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করার জন্য নয়। এমন হলে এটা রাসূল সা: এর মোজেযা থাকতো না বা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হত না; অথবা হয়তো তখন এটাকে এমন এক মোজেযা হিসাবে মানুষ দেখতো যাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে না পেরে তারা এটা মানতে বাধ্য হতো- তাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন, তার প্রয়োগ আর তারা ঘটাতে পারতো না। সব এক কাতারে চলে আসতো। দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য নষ্ট হতো।

৩. রাসূল সা: গাছকে উত্তর দিল:

গাছ কিভাবে রাসূল সা: এর কথা শুনে উত্তর দিল সে নিয়ে অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন, এক লজ্জাবতী গাছ রাসূল সা: এর কথায় সাড়া দিয়ে বলে উঠে আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ইবনে উমর বলেন, আমি রাসূল সা: এর সাথে এক সফরে ছিলাম।এক বেদুইন রাসূল সা: কে দেখে কাছে আসলে তিনি জানতে চান: বেদুইন, তুমি কোথায় যাচ্ছো? লোকটি বলে: আমার পরিবারের কাছে। রাসূল সা: বললেন, তুমি কি ভালো কিছু চাও? বেদুইন জানতে চাইলো- সেটা কি? রাসূল সা: বললেন: তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া যার কোন শরিক নেই ও মুহাম্মদ সা: আল্লাহর দাস ও রাসুল। বেদুইন বললো, আপনি যে সত্য বলছেন তার সাক্ষ্য কে দেবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন- ওই লজ্জাবতী গাছটি সাক্ষ্য দেবে। রাসূল সা: গাছকে বললেন তিনবার সাক্ষ্য দিতে ও গাছটি তাই করল, তারপর নিজ জায়গায় ফিরে গেল। এমনকি, জড়ো পদার্থ পাথরও রাসূল সা: কে তিনবার অভিবাদন জানায় ও সাক্ষ্য দেয় যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দেখলাম রাসুল সা: যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সব গাছ ও পাথরই বলছিলো, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক,হে আল্লাহর রাসূল সা: (আল তিরমিযী)।

৪. অফুরন্ত পানি ও খাবার:

আল্লাহ তার রাসূল সা: কে সারা জীবন ধরেই নানাভাবে রহমত দান করেছেন। রাসূল সা: স্পর্শ করেছেন বা দোয়া করেছেন এমন কিছুতে আল্লাহর রহমতে বরকত বাড়তো। হাদিসে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে। যখন দেখা যাচ্ছিল পানীয় খাবার খুবই কম, তখন রাসূল সা: এর উপস্থিত অফুরন্ত পানি ও খাবার পাওয়া যায়। একবার পানি এত কম ছিল যে সাহাবীরা ওযুও করতে পারছিল না। রাসূল সা:কে আল্লাহ মোজেযা দান করলেন। ফলে সেই পানিতেই অসংখ্য মানুষ ওযু করলেন। আরেকটি হাদিসে আছে রাসূল সা: পা দিয়ে আঘাত করার পর ওই জায়গা থেকে প্রচুর পানি বের হয়। আমর ইবনে শুয়াইব জানান, একবার রাসূল সা: এর সাথে তিনি যাচ্ছিলেন। তখন আবু তালিব বললেন, পিপাশা পেয়েছে কিন্তু আমার কাছে কোন পানি নেই। তখন মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করলেন। মাটির নিচ থেকে পানি বের হতে থাকলো। রাসূল সা: বললেন, পান করো। একইভাবে সাহাবীরাও বলেছেন যে রাসূল সা: এর উপস্থিতিতে কখনোই পানি ও খাবার কম পড়তো না ও সবাই পেট ভরে খেতে পারতো। আবু হুরায়রা জানান, মসজিদে যত মানুষ ছিল সবাইকে রাসূল সা: দাওয়াত দিতে বললেন।

তিনি সবাইকে জড়ো করলেন ও একটি পাত্র রাখলেন সবার সামনে। সবাই পেট ভরে খেয়ে চলে গেল। পাত্রে খাবার একই রকম রয়ে গেল- শুধু তার মধ্যে আঙ্গুলের দাগ দেখা যাচ্ছিলো। রাসূল সা: ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ এজন্য তাঁর উপস্থিতিতে এত বরকত ছিল যে পানি ও খাবারের প্রাচুর্য দেখা দিতো।

৫. অস্তমিত সূর্য উদিত হওয়া:

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা: হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা: খয়বরের নিকটবর্তী সহরা নামক স্থানে ছিলেন, তিনি স্বীয় শির মুবারক হযরত আলী রা: এর কোলে রেখে আরাম করছিলেন। তখনও হযরত আলী রা: এর আসরের নামাজ পড়েন নাই, ইতিমধ্যে ওহী অবতীর্ণ হতে লাগল এবং সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। রাসূল সা: জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি আসরের নামায পড়েছ? তিনি আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! পড়িনি। রাসূল সা: ঐ মুহূর্তে হাত উঠিয়ে বললে, হে আল্লাহ! আলী তোমার রাসুলের অনুসরণে (ব্যস্ত) ছিল। সূর্যকে পুনরায় উদিত করে দাও, যেন সময় মতো আসরের নামায আদায় করতে পারে। আসমা বিনতে উমাইস রা: বলেন, অস্তমিত হওয়ার সূর্য পুনরায় ফিরে এসেছে এবং উহার কিরণ জমিন এবং পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

৬. সূর্য স্থির থাকার মোজেযা:

এই অলৌকিক ঘটনাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ হতে তাশরীফ আনলেন। কুরাইশদের নিকট তিনি মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে "বাইতুল মাকদাসের" নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, আরো জিজ্ঞাসা করল যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনকারী কাফেলা কবে ফিরে আসবে? তিনি বর্ণনা করলেন, সে কাফেলা বুধবারে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করবে। বুধবারে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগলো তখন কাফিররা গোলমাল করতে লাগলো। রাসুল সা: দোয়া করলেন, আল্লাহ পাক সূর্যকে যথাস্থানে থামিয়ে দিলেন। এদিকে কাফেলা এসে পৌঁছালো। এভাবেই আল্লাহ পাক তাঁর সততা প্রকাশ করেছেন।

৭. হরিণের সঙ্গে কথা বলার মোজেযা:

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা: বলেন- আমি মদিনার কোন এক গলিতে রাসূল সা: এর সঙ্গে ছিলাম। অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম যে একটা হরিণ বাঁধা আছে। হরিণটি রাসূল সা:কে দেখি অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ বেদুইন লোকটি আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে, জঙ্গলে আমার দুটি বাচ্চা রয়েছে, আমার স্তন দুধে ভরে

আছে। যার কারণে আমার কষ্ট অনুভব হচ্ছে, আমাকে জবাইও করে না যেন এ বিপদ হতে মুক্ত হতে পারি। আবার ছেড়েও দেয় না যেন জঙ্গলে গিয়ে নিজ বাচ্চাদের দুধ পান করাতে পারি। তৎক্ষণাৎ রাসূল সা: সেই হরিণটিকে বললেন, আমি যদি তোমার রশির বাঁধন খুলে দেই তাহলে কি তুমি ফিরে আসবে? হরিণ বলল, অবশ্যই আমি ফিরে আসবো। যদি আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি তাহলে আমাকে আল্লাহ পাক কঠিন শাস্তি দিবেন। এই কথা শুনে রাসূল সা: হরিণটিকে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ফিরে আসলো। রাসূল সা: পুনরায় হরিণটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিলেন। একটু পরেই বেদুইন লোকটি আসলে রাসূল সা: তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই হরিণটিকে তুমি কি আমাদের নিকট বিক্রি করবে? উত্তর সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই হরিণটি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিলাম। রাসূল সা: নিয়ে ছেড়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন স্বয়ং আমি দেখেছি যে, হরিণটি "সুবাহানাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলতে বলতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

৮. বিশ্বনবী সা: এর সঙ্গে দুই মাসের শিশুর কথোপকথন:

অমুসলিম এক রমণী দুই মাসের এক শিশুকে কোলে নিয়ে রাসূল সা: কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। শিশু বাচ্চাটি রাসূল সা: এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ!আসসালামু আলাইকুম। আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। মা রাগান্বিত গলায় তাকে বলল চুপ থাকো, তোমাকে এ ধরনের সাক্ষ্য প্রদান কে শিক্ষা দিয়েছে? শিশুটি বলল মা! তুমি তো মাথার ওপর দেখো না, হযরত জিবরাঈল আ: দাঁড়িয়ে আছেন যিনি আমার নিকট শত শত দলিল সমতুল্য। শিশুটির মাথার উপর মা হযরত জিবরাঈল আ: কে একটি পরিপূর্ণ চন্দ্রের মতো দেখতে পেল। শিশুটি বলল মা! ঐ ফেরেশতা আমাকে রাসূল সা: এর গুণ শিক্ষা দিচ্ছেন এবং শিরকের নাপাক জ্ঞান ভান্ডার হতে মুক্তি দিচ্ছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা: শিশুটির নাম জিজ্ঞেস করলে শিশুটি বলে, আমার নাম আ: আজিজ কিন্তু মুশরিকরা আমার নাম রেখেছে 'আ: উজ্জা' অথচ আমি 'উজ্জ' নামক মূর্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। ঐ সময় জান্নাত থেকে এমন সুগন্ধ ভেসে আসলো যা দ্বারা শিশু ও তার মায়ের মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়ে গেল। ঐ মুহূর্তেই শিশু ও তাঁর মা ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করল এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিল।

৯. তরবারী বাধা প্রাপ্ত হওয়ার মোজেযা:

আমের ইবনে তোফায়েল রাসূল সা: এর দরবারে অসৎ উদ্দেশ্য উপস্থিত হয়েছে যে, তাঁকে প্রতারণা দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নিবে। এরই ভিত্তিতে সে রাসুল সা: এর মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আরবাদ ইবনে কায়েসকে কুবুদ্ধি শিখিয়ে দিল যে, যখন আমরা রাসূল সা: এর নিকটে যাব তখন আমি তাকে আলোচনায় মত্ত করে আমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখবো। তোমার দিকে তার দৃষ্টি থাকবেনা। তখন নির্দ্বিধায় তাঁর উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করবে। দরবারে সকলেই উপস্থিত হল। নিজের দিকে ভালো করে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমের রাসূল সা: কে বলল- আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করুন। রাসুলুল্লাহ সা: বললেন, বন্ধুত্ব করার পদ্ধতি মাত্র একটি আর তা হলো এক আল্লাহ পাকের বিশ্বাসী হয়ে যাও। তখন সে রেগে বলে উঠলো, রাসুলুল্লাহ সা: শুনে রাখ আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করব এবং তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লাল ঘোড়া ও বীর যোদ্ধাদের নিয়ে এ জমিন ভরে দেব। এ কথা বলে, সে ফিরে চলে গেল। মজলিস থেকে উঠে গিয়ে আমের আরবাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে দুর্ভাগা আরবাদ! তুমি কি করছিলে? আমার কথা মতো তুমি কেন কাজ করো নাই' আরবাদ বলল, 'আমি গৃহীত পরামর্শ অনুযায়ী রাসূল সা: এর উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আমি কি করবো যখনই তরবারী উত্তোলন করি তখনই দেখি তরবারীর নিচে তুমি দুর্ভাগা আমের। যদি তরবারী দ্বারা আঘাত করি তাহলে তুমি মারা যেতে মোহাম্মদ নয়। এখন বল আমি কিভাবে আমার তরবারীকে তোমার রক্তে রঞ্জিত করতে পারি'।

১০. লাগাতার বৃষ্টি হওয়ার মোজেযা:

হযরত আনাস রা: হতে বর্ণিত, রাসূল সা: এর জীবদ্দশায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাসূল সা: জুম্মার খুতবা পাঠ করবেন এমন সময় এক বেদুইন ব্যক্তি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে লাগল- ইয়া রাসুলুল্লাহ! দুর্ভিক্ষের কারণে জন্তুসমূহ মরে গেছে, নাবালক শিশুরা ক্ষুধার্ত। আপনি দোয়া করুন। রাসূল সা: তৎক্ষণাৎ দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠালেন। ঐ সময় আকাশে এক খন্ড মেঘমালাও চোখে পড়ে নাই। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার কুদরতের সৃষ্টিতে আমার জীবন দুয়া শেষ করে এখনও হাত নামিয়ে ফেলেন নি যে, পাহাড়ের মত বড় বড় মেঘ খণ্ড দৃষ্টিগোচর হল। রাসূল সা: এখনও মিম্বর হতে অবতরণ করেনি যে, তার দাড়ি মোবারক বৃষ্টির পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে লাগলো।

এই জুম্মার দিন হতে পরবর্তী জুম্মার দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হতে লাগলো। পুনরায় সেই বেদুইন ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে আবেদন করতে লাগল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! অতি বৃষ্টির কারণে দালান কোঠা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সা: দোয়ার জন্য উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন- হে আল্লাহ! আমাদের শহরের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, শহরের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করো না। এ কথা বলে রাসূল সা: যেই কোণার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন মেঘমালা সেদিক থেকে সরে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আসমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাসূল সা: এর জীবনে এমন কোন দিক নেই যা মোজেযা ছাড়া। এসব মোজেযা আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করে, বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় করে ও কাফিরদের সত্য গ্রহণে দাওয়াত দেয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন। তাই মোজেযা দেখার পরেও সবাই তাতে বিশ্বাস আনেনি। রাসূল সা: কখনো দাবি করেন নি যে মোজেযা প্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁর আছে। এসব আল্লাহর হুকুমে হয়েছে।

১১. সামান্য আহারে বরকত:

খাবারে বরকত সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এসেছে। তার মধ্যে একটি হলো- হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। কিন্তু যথা সময় নবীজি তাকে বললেন, বড় বড় দেখে ত্রিশ জন আনসারীকে দাওয়াত কর। নবীজির হুকুম অনুযায়ী ত্রিশজন আনসারী এসে খেয়ে গেল। অবশেষে দেখা গেল, ঐ দুজনের খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী তৃপ্তি সহকারে আহার করবার পরও খাবার বেঁচে গিয়েছে (বায়হাকী)। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সামান্য খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী পেট ভরে আহার করলো এবং এই মুজিযা দেখে সকলে ইসলাম কবুল করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো। তিনি আরো বলেন, সেই দিন ঐ খাবার দ্বারা সর্ব মোট একশ আশিজন তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলো। উপরোক্ত ঘটনাটি ঐ সময়ের, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা হতে হিজরত করে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে সাময়িকভাবে মেহমান হিসেবে অবস্থান করছিলেন।

১২. নবীজির দোয়ার বরকত:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করলেন- ইয়া আল্লাহ! ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের সমঝ ও তাফসীরের এলেম দান কর।

নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার বরকতে তিনি এমন এলেম হাসিল করলেন যে, অবশেষে তাঁকে ‘বড় আলেম’ উপাধিতে ভূষিত করা হলো। তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি ‘তরজুমানুল কুরআন’ উপাধি লাভ করেছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩. প্রাণীর আনুগত্য:

ইমাম আহমদ এবং নাসায়ী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনসার গোত্রের প্রত্যেকেই উট পালন করতো। এক বাড়িওয়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, আমার একটি উট রয়েছে যার পিঠে করে আমি পানি এনে থাকি। উটটি বড় বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে। বোঝা বহন করতে চায় না। আর এদিকে আমার খেজুর বাগান পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উটটির কাছে গেলেন। তিনি বাগানে পৌছলেন এবং একস্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগানের এক কোণে বসা ছিলো উটটি।

আনসারী লোকটি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটাই আমার উট, যে কুকুরের মতো মানুষকে কামড়াতে চায়। আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আপনাকেও সে কামড়ে দেয়। নবীজি বললেন, আমার ব্যাপারে ভয় করো না। তিনি উটের সামনে গেলেন। উটটি তাঁকে দেখা মাত্র মাথা উঠালো এবং তাঁর সামনে গিয়ে কদম মোবারকের কাছে মাথা নত করে সেজদা করলো। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির মাথার পশম ধরে টান দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটি একটি জানোয়ার, তার কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই। এই প্রাণীটি আপনাকে সেজদা করেছে। তবেতো আমরাও আপনাকে সেজদা করতে পারি। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, কোনো মানুষের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে অন্য একজন মানুষকে সেজদা করবে। মানুষের জন্য মানুষকে সেজদা করা বৈধ হলে আমি নারী জাতিকে তাদের স্বামীগণকে সেজদা করতে বলতাম।

১৪. জড় পদার্থের আনুগত্য:

দুনিয়ার সকল প্রাণীকুলই শুধু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামী করেননি, জড় পদার্থসমূহও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের গোলাম ছিলো। তারাও নবীজির দরবারে সালাম নিবেদন করেছে, কথা বলেছে। এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি নিঃসন্দেহে ঐ পাথরগুলোকে চিনি, যারা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে মক্কা মুকাররামায় আমাকে সালাম জানাতো। বেশির ভাগ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে এই পাথরগুলোর নাম 'যেকাকুল হাজার' যে পাথরগুলো নবীজির আসা যাওয়ার পথে তাঁকে সালাম পেশ করতো।
২। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন। উহুদ মদিনা মনোয়ারার নিকটবর্তী একটি পাহাড়। নবীজি বলেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা তাকে ভালোবাসি। তিনজন উহুদ পাহাড়ে আরোহন করলে সে কাঁপতে লাগলো। নবীজি স্বীয় কদম মোবারক তাঁর উপর রেখে বললেন, হে উহুদ! স্থির থাকো। তোমার উপর এ মুহুর্তে একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। সাথে সাথে পাহাড়ের কম্পন বন্ধ হয়ে যায়।

১৫. পানি সম্পর্কিত মুজিযা:

১। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়াতে একবার সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, সহযাত্রীদের কারো নিকট পান করার মতো পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি অজু করার পর বদনাতে যে সামান্য পানি পড়ে আছে এখন তাই শেষ সম্বল। একথা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক বদনার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গুলী হতে পানির ফোয়ারা বইতে লাগলো। সকল সাহাবা তৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে অজু করলেন। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিলো? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা পনেরশ ছিলো বটে কিন্তু এই সংখ্যা যদি লক্ষও হতো তথাপি সকলের প্রয়োজন মিটাতে ঐ পানিই যথেষ্ট ছিলো।
২। বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়াতে আমরা চৌদ্দশ ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় একটি মাত্র কূপ ছিলো। আমরা উহার সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করে শেষ করে ফেললাম। অবশেষে এতে আর এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট রইলো না। সংবাদ পেয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কূপের নিকট তাশরিফ আনলেন। একটি পাত্রে কিছু

পানি এনে তিনি অজু করলেন। অজু শেষে পুনরায় কুলি করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। অতঃপর অজু শেষে যে সামান্য পানি বেঁচে ছিলো তা কূপের ভিতরে ঢেলে দিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। বর্ণনাকারী বলেন, একটি পরেই ঐ কূপে এতো পানি বৃদ্ধি পেলো যে, আমাদের গবাদী পশুগুলো সহ আমরা সকলে তৃপ্তির সাথে পানি পান করলাম। আমরা সকলে তথায় বিশ দিন অবস্থান করলাম। ঐ সময় ঐ কূপ থেকেই আমাদের পানির চাহিদা পূরণ হয়।

১৬. রোগীদের আরোগ্য করা:

১। যায়েদ বিন আবী ওবায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা বিন আকওয়ার পায়ের যখমের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার পায়ে কি হয়েছিল? জবাবে সে বললো, খায়বরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের আঘাতে আমার পায়ে জখম হয়। জখমের ভয়াবহতার কারণে মানুষের মধ্যে রটে গেল যে, আমি শাহাদাত বরণ করেছি। কারণ ঐ আঘাতের পর বেঁচে থাকা স্বাভাবিক ছিলো না। সালামা বিন আকওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ঐ জখম নিয়ে হাজির হলে তিনি ক্ষতস্থানে তিনবার দম করলেন। ফলে তার জখম সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো।

২। হযরত কাতাদা ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখে উহুদের যুদ্ধের দিন আঘাত লেগেছিলো। চোখের মণি বের হয়ে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছিলো। তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসি। আমার চোখের এরুপ যখম নিয়ে তার নিকট যেতে আমি অস্বস্থিবোধ করছি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার চোখের মণিটি হাত দিয়ে ধরে কোটরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ চোখটি ভালো করে দাও। তাঁর চোখটি অপর চোখের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলো। কখনো অপর চোখে যন্ত্রণা হলেও এই চোখটি সবসময় সুস্থ থাকতো।

১৭. নবীজির বদদোয়া:

১। সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসলিম বর্ণনা করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি বাম হাতে আহার করছিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নসীহত করে বললেন, ডান হাতে আহার করো। কিন্তু ঐ হতভাগ্য এ বলে নসীহত প্রত্যাখ্যান করলো যে, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। অথচ তার ডান হাতে কোন অসুবিধা ছিলো না। তার ঐ বেপরোয়া উত্তরের জবাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খেতে

পারবে না। অতঃপর তার ডান হাত এমন অকেজো হয়ে গেলো যে, তা আর মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারতো না।

২। হায়হাকী, হাকিম এবং ইবনে ইসহাক বলেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লাহাবের ছেলে উতবার জন্য বদ দোয়া করে বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুকুর জাতীয় প্রাণী হতে কোন একটি কুকুরকে তার পেছনে লেলিয়ে দাও। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বদ দোয়ার পর উতবাকে একটি বাঘ আক্রমণ করে শেষ করে ফেলেছিলো।

৩। বায়হাকী বর্ণনা করেন, হাকাম বিন আবিল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসা ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন সে নাক মুখ ভেংচাতো এবং মুনাফিকদের দিকে চোখের ইশারা করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উপর হাসি তামাশা করতো। নবীজি তার এই অশালীন আচরণ দেখে বললেন, তুমি এরুপই হয়ে যাবে। অতঃপর সে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত অনুরুপভাবে মুখ ভেংচাতে ছিলো।

১৮. হযরত জাবেরের মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করা:

একদা হযরত জাবের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। নবীজিকে মেহমানদারীর জন্য তিনি একটি বকরী জবেহ করেছিলেন। বকরী জবেহ করার দৃশ্যটি দেখে তার সন্তান দুটির মনে কৌতুহল হলো। বকরীটি জবেহ করার অনুকরণে বড় ছেলেটি তার ছোট ভাইটিকে শুইয়ে দিলো এবং তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিলো। তাদের মা এই দৃশ্য দেখে দৌড়ে আসছিলেন। রক্তাক্ত ছোট ভাইকে দেখে বড় ছেলেটি ভয় পেয়ে বাড়ির উপর তলা থেকে ঝাপ দিয়ে পড়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাওয়াত খেতে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে আসলেন, এসে দেখলেন হযরত জাবেরের দুই ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। নবীজি তখন তার দুই ছেলেকে জীবিত করে দিয়েছিলেন।

১৯. হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সাপের বিষ থেকে রক্ষা:

একদা হিজরতের সময়ে মদিনায় যাওয়ার পথে সাওর পর্বতের চুড়ায় পৌছে একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহার ভিতরে ঢুকে গুহা পরিষ্কার করে চারিদিকের ছিদ্র গুলি কাপড় ছিড়ে বন্ধ করে দিলেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করার মতো কাপড় ছিলো না। তিনি তখন নিজের পা দিয়ে সেই ছিদ্রটি বন্ধ করে

দিলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরের কোলে মাথা মোবারক রেখে শুয়ে পড়লেন এবং নবীজির তন্দ্রা এসে গেলো। হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ছিদ্রে পা রেখেছিলেন, তার ভিতরে ছিল একটি সাপ। এই সাপটি এক হাজার বছর ধরে নবীজির দীদারের আশায় এই গুহায় অবস্থান করছিল। সাপটি তিনবার ফোঁস ফোঁস করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পা সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংকেত দিচ্ছিলো। অবশেষে যখন হযরত আবুবকর পা সরালেন না তখন সাপটি হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করলো। সাপের বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় তিনি নড়াচড়া করলেন না যাতে প্রিয় নবীর আরামে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। হঠাৎ করে তার দুফোটা চোখের পানি নবীজির চেহারা মোবারকের উপর পড়লো। তখনি নবীজির তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুবকর! কি হয়েছে? আবু বকর বললেন, সাপে দংশন করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি থুথু মোবারক আবু বকরের দংশিত স্থানে মালিশ করে দিলেন। সাথে সাথে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২০. শুকনো ওলান দুধে ভরে যাওয়ার ঘটনা:

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় রাসূল সা: উম্মে মা’বাদ নামে এক মহিলার বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। যার আতিথিয়েয়র জন্য মদীনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে অপেক্ষায় আছেন। আজ তিনি উম্মে মা’বাদের বাড়িতে স্বেচ্ছায় অতিথি হয়েছেন। এ ভাগ্যবতী মহিলার চেয়ে সৌভাগ্যবতী আর কে আছে?

দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে আল্লাহর রাসূল সা: ক্লান্ত-শ্রান্ত, উপরন্তু তিনি ভীষণ ক্ষুধার্তও ছিলেন। রাসূল সা: তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কাছে কোনো খাবার আছে কি? মহিলা উত্তরে বললেন, যদি কিছু থাকতো তাহলে আপনাদের মেহমানদারী করতে মোটেও অপেক্ষা করতাম না, বকরীগুলোও মাঠে।

রাসূল সা: বলেন, এ বকরী এখানে কেন? মহিলা উত্তর দিলেন, এটা খুবই দুর্বল, হাঁটতে পারে না, তাই মাঠে পাঠানো হয়নি। রাসূল সা: বললেন, যদি অনুমতি দেন, তাহলে এর দুধ দোহন করি? মহিলা বললেন, হ্যাঁ, যদি দুধ পান তাহলে দোহন করতে পারেন। দুর্বলতার কারণে মুলত তার ওলান শুকিয়ে পেটের সাথে লেগে গিয়েছে এবং তার স্তনে কোনো দুধই ছিল না।

কিন্তু রহমত বরকত ও কল্যাাণের নবী ঐ বকরীটির কাছে গেলেন এবং বরকতপূর্ণ হাতখানা ওলানে বোলালেন ও আল্লাহর নাম নিয়ে দুআ করলেন। কুদরতে এলাহীর অপার মহিমায় সাথে সাথে বকরীর ওলান দুধে ভরে গেলো, আর বকরীটি তার পেছনের পা দুটি ফাঁক করে দাঁড়ালো।

নবী সা: একটি বড় পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করলেন। অতপর সাথীদের নিয়ে তিনি নিজে খেলেন এবং উম্মে মা'বাদকে পান করালেন। এরপর আবার দোহন করে পাত্রটি ভরে উম্মে মা'বাদ এর হাতে দিয়ে বিদায় নিলেন।

উম্মে মা'বাদ বলেছেন, রাসূল সা: এর বরকতের পরশে বরকতমণ্ডিত এই বকরীটি হযরত ওমর রা: এর শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। আমরা প্রতিদিন বিকেল বেলা বকরীর ওলান দোহন করে দুধ পান করতাম, অথচ খড়া ও দুর্ভিক্ষের সময়ে কারো বকরী দুধ দিত না।

আল্লাহ অলৌকিকভাবে রাসূল সা: কে রক্ষা করেন:

রাসূল সা: ও তার অনুসারীদের কষ্ট দিতে ও তাঁদের জীবনকে দুর্বিসহ ও করতে মূর্তি উপাসকরা সব রকম চেষ্টা চালাতো। মুসলমানদের এক ঘরে করা হলো, শারীরিক নির্যাতন চালানো হলো, এমনকি অনেককে মেরেও ফেলা হলো। মক্কার লোকেরা এমন শত্রুতার মুখে রাসূল সা: ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় হিযরত করতে বাধ্য হন। রাসূল সা: এর চরিত্রের শক্তিমত্তার বড় প্রমাণ হলো তিনি কখনো বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেননি। মদিনায় রাসূল সা: এর শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক ছিল মুনাফিকরা। তারা ভান করত যে তারা বিশ্বাসী এবং রাসূল সা: এর কাছে এসে তারা সময় কাটাতো। তারা কাফেরদের সাথে মিলে রাসূল সা: এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। রাসূল সা: যে সময় সংগ্রাম করেছিলেন, তখন বিভিন্ন দল তাঁর প্রচন্ড বিরোধিতা করে। এই চরম শত্রুতার মুখে এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার যে উহুদের যুদ্ধে কয়েকটি দাঁত হারানো ও আহত হওয়া ছাড়া আল্লাহর রহমতে রাসূল সা: এর আর তেমন কোনো ক্ষতিই কখনো হয়নি।

কুরআনে বলা হয়েছে- "আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফেরদের হেদায়েত করেন না"। (সূরা মায়িদাহ; ৫:৬৭)

অদৃশ্যের জ্ঞান রাসূল সা:কে দেওয়া হয়: একমাত্র আল্লাহরই আছে অদৃশ্যের পুরো জ্ঞান। অতীতের খুঁটিনাটি তথ্য থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ সবই জানেন। আল্লাহ জানেন মহাবিশ্বের কোথায় কি ঘটছে ও তিনিই এর নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসূলদের সা: এই জ্ঞানের কিছুটা দান করেন- ততটুকুই যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।

১. রাসূল সা: এমন সব ঘটনা জানতেন যা অন্য কেউ জানতো না:

কুরআনে আল্লাহ এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। রাসূল সা: একটি গোপন কথা তার স্ত্রীকে বলে কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাসূল সা: এর স্ত্রী সে কথা অন্য একজনের কাছে ফাঁস করে দেন। আল্লাহ এটি রাসূল সা: কে জানান। রাসূল সা: যখন তার স্ত্রীকে বলেন যে তিনি জেনে ফেলেছেন ঘটনাটা। তখন স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চান রাসূল সা: কিভাবে ঘটনাটি জানলেন। রাসুল সা: এর উত্তর ছিল- আল্লাহ জানিয়েছেন আমাকে।

আল্লাহ মুনাফিকদের মিথ্যা সম্পর্কে ও মুখের কথার আড়ালে তাদের সত্যিকারের মনোভাব কি- তা সব কিছুই প্রকাশ করেন। এতে রাসূল সা: বুঝতে পারেন সত্যিকারের মুসলমান কারা ও কারা মুনাফিক। ফলে কোন মানুষকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে যায় না তা রাসুল সা: সহজেই বুঝতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সা: ছিলেন মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু, তাই আল্লাহর তরফ থেকে এটা ছিল সত্যিই বড় রকমের সাহায্য ও হেফাজত। রাসূল সা: এর একটি মোজেযা যা আল্লাহ তাকে দান করেন তা হলো উনি নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীর র: মৃত্যুর কথা আগে থেকেই জানতেন। হাদিসে আছে রাসূল সা: বলেন, ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের আগে তিনিই সবার আগে মারা যাবেন। রাসূল সা: কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেন।

২. বাইযেনটাইনদের জয়:

কুরআনের সূরা রোমের শুরুতে একটি ভবিষ্যৎবাণী আছে। এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, রোমান বা বাইজেনটাইন সম্রাট যুদ্ধে পারসিয়ানদের বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি জয়ী হবে। রোমানদের বিজয়ের যে ভবিষ্যৎবাণী কুরআনে করা হয় তা সাত বছর পর ৬২০ খ্রিস্টাব্দে সত্য হয়। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রোমান ও পারসিয়ানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এখানে রোমান বা বাইযেনটাইনিজরা পারসিকদের হারিয়ে দেয়। কয়েক মাস পর পারসিক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় ও তাদের দখলে থাকা বহু এলাকা

রোমানদের ফিরিয়ে দেয়। তাই বলা যায় কুরআন ও রাসূল সা: এর ভবিষ্যৎবাণী "তিন থেকে নয় বছরের" মধ্যে রোমানদের বিজয় অলৌকিক ভাবে সত্যে পরিণত হয়।

৩. ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে গেল:

ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে যাওয়ার বিষয়ে আবু মুসা থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেন- রাসূল সা: বলেন আমি স্বপ্নে একটি তরবারী ঘুরালাম। সেটা মাঝখান থেকে ভেঙে গেল। এটি উহুদ যুদ্ধে বিশ্বাসীদের ক্ষয়ক্ষতির প্রতীক। আমি আবার তরবারী ঘুরালাম সেটা আগের থেকে অনেক ভালো তরবারীতে পরিণত হল। এটা ইসলামের জন্য মক্কার উন্মুক্তকরণ ও আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসীদের সমবেত করা বোঝাচ্ছে।

৪. ইসলামের জন্য মিসর উন্মুক্তকরণ:

আবু দার বর্ণনা করেন: রাসূল সা: বলেন, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি মিসর জয় করবে। এটা সেই ভূমি যার নামে কিরাত এর নামকরণ হয়েছে। তাই তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন সেখানকার মানুষদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে (মুসলিম)। এই হাদিসে ইসলামের জন্য মিসরের দ্বার খুলে যাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। যখন এটা বলা হয়, তখন রোম সম্রাট মিসর শাসন করতেন। মুসলিম বাহিনীর তখন এই ক্ষমতা ছিল না যে তারা রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে। রাসূল সা: এর ভবিষ্যৎবাণী পরে সত্য হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমর রা: এর সময়ে মুসলমানরা আমর ইবনে আল আস এর নেতৃত্বে মিসর জয় করে।

৫. কিয়ামতের আলামত:

অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বেশ কিছু বিষয়ের ভবিষ্যৎবাণী রাসূল সা: করে যান। তাঁর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরে আমরা দেখছি অনেক কিছুই এখন ঘটছে। আনাস ইবনে মালিক বলেন, আমি রাসুল সা: কে বলতে শুনেছি- কিয়ামতের আলামত হলো জ্ঞান অদৃশ্য হবে ও অজ্ঞতার প্রসার হবে; ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে; মদ খাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হবে; পুরুষের সংখ্যা কমবে ও নারীর সংখ্যা বাড়বে যতক্ষণ না অবস্থা এমন দাড়ায় যে এক পুরুষকে ৫০ মহিলার দেখাশুনা করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূল সা: আমাদের কাছে এসে বললেন- হে মুহাজিরদের দল; যদি পাঁচটি জিনিস তোমাদের মধ্যে দেখা দেয়, তবে নানাভাবে তোমরা শাস্তি পাবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তোমরা এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারো। কোন দলের মধ্যে অশালীনতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা তারা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে; এমন ধরনের অসুখ তাদের হয় যা তাদের আগেকার মানুষদের কখনো হয়নি। যদি তারা

মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাহলে খরা ও ভয়াবহ দুঃখ দেখা দিবে ও স্বৈরশাসক তাদের উপর নেতৃত্ব করবে। যদি তারা সম্পত্তির যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তবে তারা বৃষ্টির রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে আল্লাহ বাইরের শত্রুদের মধ্যে থেকে কাউকে তাদের শাসক বানাবেন- যে তাদের যা আছে তা থেকে কিছু দখল নিয়ে নেবে। শাসকরা যদি আল্লাহর দেয়া আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান মেনে না চলে ও নিজ ইচ্ছামতো চলে যার ভিত্তি কুরআনে নেই, তাহলে আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবেন (ইবনে মাজাহ)।

উপসংহার:

মোজেযা হলো অসাধারণ কিছু যা ঘটানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে ঘটে। মোজেযা যে শুধু হযরত মুসা আ: এর সমুদ্র ভাগ করা বা হযরত ঈসা আ: এর অন্ধকে ভালো করে তোলার মতো দৃশ্যমান কোন ঘটনাই হবে- তা নয়। বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে আল্লাহর সমর্থন দান, বিপদের সময় আল্লাহর তরফ থেকে ওহী ও সাহায্য পাঠানো- এসব সাধারণ ভাবে যত ছোটই মনে হোক না কেন- এগুলিও মোজেযা। হযরত মুহাম্মদ সা: কে বিভিন্ন ধরনের মোজেযা দান করা হয় যা তাঁর জীবনের সব ক্ষেত্রে ছাপ ফেলেছে। এই মোজেযা কেউ চোখে দেখেনি, তবে বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে প্রমাণিত যা বিশ্বাস করতে মানুষ বাধ্য হয়। অনেক সময় মানুষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মোজেযা দান করা হয়। মোজেযার কারণে কিছু মানুষ সত্য পথে আসে, কিছু মানুষ রয়ে যায় কঠিন মন নিয়ে। তারা আল্লাহর এসব নিদর্শনকে জাদুবিদ্যা বলে। এটা আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি চাইলে এমন মোজেযা দেখানো যেতো যাতে সবাই বিশ্বাস আনে।

কুরআনে বলা হয়েছে- "আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন পাঠাতে পারতাম, যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যেতো"। (সূরা আশ শু'রা; ২৬:৪)

সব রাসূলকে দেয়া মোজেযাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে হযরত মুহাম্মাদ সা: কে দান করা মোজেযা একটি বিশেষ বিবেচনায় আলাদা- রাসুল সা: এর মোজেযা অনেক বেশি মানুষ দেখেছে। রাসূল সা: আমাদের জন্য অলৌকিক কুরআন রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই-

যেভাবে এটা তাঁর কাছে নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন; একজন তাই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এই মোজেযা পাঠ করবে ও কুরআনের আদর্শকে গ্রহণ করবে অথবা ত্যাগ করে এই মোজেযাকে অস্বীকার করবে।

কুরআনে বলা হয়েছে- "যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে তা তেলাওয়াত করে, তারাই কুরআনে বিশ্বাস আনে। যারা অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত"। (সূরা বাকারা; ২:১২১)

তথ্যসূত্র:

১. শহীদুল ইসলাম, আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সা: এর জীবনী। ২০২০

২. ইয়াহিয়া, হারুন। রাসূল মুহাম্মাদ সা: এর মুজেজা

৩. ইসলাম আশরাফী, মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল। প্রিয় নবী সা: এর মুজেযা

৪. মায়মূন, মাওলানা আহমদ। মু'জিযা: পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক কথা। আগষ্ট, ২০১৬